দারসে কুরআন সিরিজ-০৫

কুরবাণীর শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-৫

কুরবানীর শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

www.pathagar.com

কুরবানীর শিক্ষা
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

প্রকাশ কাল :
প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর: ১৯৮৮ ইং
২৫তম প্রকাশ নভেম্বর ২০১১ ইং

প্রচ্ছদ: আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ : আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬,শিরিশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০.০০ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

সূচীক্রম

০১.	মূল আয়াত	০৫
০২.	অনুবাদ	০৬
০৩.	শব্দার্থ	০৬
০৪.	এ আয়াত থেকে শিক্ষা	১২
০৫.	শিক্ষা	১৬
০৬.	নেতৃত্বের যোগ্যতা	১৯
০৬.	উপসংহার	২২

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তাদের জন্য

- যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- যারা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী।
- যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না।
- যারা ইমাম, খতীব ও মুবাল্লিগ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা।
- সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।
- লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

কুরবানীর শিক্ষা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَاتَنْحِتُوْنَ * وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ *
قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ * فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا
فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ * وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ *
رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ * فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ
مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ
مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ
مِنَ الصّٰبِرِيْنَ * فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ * وَنَادَيْنٰهُ اَنْ
يّٰاِبْرٰهِيْمَ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ *
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ * وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ * وَتَرَكْنَا
عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ * سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ * كَذٰلِكَ نَجْزِى
الْمُحْسِنِيْنَ * اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ * الصفت ٩٥-١١١

www.pathagar.com

অনুবাদ ঃ তিনি (হযরত ইব্রাহীম আ) বললেন, তোমরা কি তার দাসত্ব করবে যা তোমরা নিজেরা হাতে গড়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তোমরা যা হাতে বানাও তারও সৃষ্টিকর্তা। তারা বলল, প্রস্তুত কর তার জন্য আগুনের কুণ্ডলী এবং তাঁকে নিক্ষেপ কর সেই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে। এভাবে তারা চক্রান্ত করলো আর আমি তাদের চক্রান্ত বানচাল করে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করলাম। আর তিনি বললেন আমি আমার প্রভুর দিকে চললাম, তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন। হে প্রভু আপনি আমাকে নেক সন্তান দান করুন। অতঃপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম এক অতীব ধৈর্যশীল সন্তানের। পরে যখন সে সন্তান তার সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ানোর বয়সে পৌঁছলো তখন তিনি একদিন বললেন, হে বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, (আল্লাহর হুকুমে) আমি তোমাকে জবেহ করতেছি। এখন তুমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখ এবং বল তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন, হে পিতা, আপনি তাই করুন যা করতে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে দেখতে পাবেন। অতঃপর যখন দুই জনই আল্লাহর আদেশ মানতে রাজী হলেন তখন পিতা পুত্রকে জবেহ করার জন্যে শুইয়ে দিলেন। আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই নেক বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা একটা স্পষ্ট বড় ধরনের পরীক্ষা। আর আমি তাকে বিনিময় করে নিলাম এক বড় কুরবানীর দ্বারা এবং তা পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্থাপন করলাম। শান্তি বর্ষিত হোক ইব্রাহীমের উপর। আমি এভাবেই নেক বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। অবশ্যই তিনি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

শব্দার্থ ঃ قَالَ - তিনি বললেন। اَ – কি। تَعْبُدُوْنَ – তোমরা দাসত্ব করবে। مَا – যা। تَنْحِتُوْنَ – তোমরা (নিজ হাতে) তৈরী করেছ। خَلَقَكُمْ - সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে। وَ – এবং। تَعْمَلُوْنَ – যা তোমরা নিজেরা তৈরী কর। قَالُوْا – তারা বললো। اِبْنُوْا – প্রস্তুত কর। لَهٗ – তাঁর জন্য। بُنْيَانًا – আগুনের কুণ্ডলী। فَاَلْقُوْهُ – অতঃপর

নিক্ষেপ কর তাকে। فِى الْجَحِيْمِ – জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে। فَ – অতঃপর। اَرَادُوْا – ইচ্ছা করলো। كَيْدًا – চক্রান্ত। جَعَلْنٰهُمْ – তাদেরকে বানালাম। اَسْفَلِيْنَ – হেয়। اِنِّىْ – অবশ্য আমি। ذَاهِبٌ – যাচ্ছি। اِلٰى – দিকে رَبِّىْ – আমার প্রভুর। سَيَهْدِيْنِ–অবশ্য তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। رَبِّ – হে আমার প্রভু। هَبْ لِىْ – দান কারুন আমাকে। صٰلِحِيْنَ – নেক বান্দা। (এখানে সন্তান বুঝতে হবে) حَلِيْمٍ। বুঝতে হবে - بَشَّرْنٰهُ - আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম। بِغُلٰمٍ – পুত্রের। حَلِيْمٍ – অতীব ধৈর্যশীল। لَمَّا – যখন। بَلَغَ - পৌঁছল। مَعَهٗ – তাঁর সঙ্গে। – سَعْىَ দৌড়াদৌড়ি (করার বয়সে) يٰبُنَىَّ – হে পুত্র। اِنِّىْ – অবশ্যাই আমি। اَرٰى – দেখেছি। فِى – - মধ্যে। مَنَامِ স্বপ্নে। اَذْبَحُكَ – তোমাকে জবেহ করতেছি। فَانْظُرْ – এখন তুমি ভেবে দেখ। مَاذَا – تَرٰى তোমার মত কি? يٰاَبَتِ – হে পিতা। اِفْعَلْ – আপনি করুন। – مَاتُؤْمَرُ যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন। سَتَجِدُنِىْ – অবশ্যাই আপনি আমাকে পাবেন। مِنَ الصّٰبِرِيْنَ – ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। اَسْلَمَا – দুই জনেই রাজী হলেন। تَلَّهٗ – শুইয়ে দিলেন। نَادَيْنٰهُ – তাকে ডেকে বললাম। قَدْصَدَّقْتَ – অবশ্যাই সত্যে পরিণত করেছ। رُءْيَا স্বপ্নকে। – كَذٰلِكَ এই ভাবেই। نَجْزِى - পুরস্কৃত করি। اَلْبَلٰؤُ الْمُبِيْنُ – এক স্পষ্ট পরীক্ষা। فَدَيْنٰهُ – অতঃপর আমি তাকে বিনিময় করে নিলাম। – بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ বড় ধরনের কুরবানীর দ্বারা।

শানে নুযুল ঃ এ সুরাটি রাসূলে করিম (সঃ) এর মাক্কি জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। যখন রাসুল (সঃ) এর উপর চরম জুলুম ও চরম বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এই ঘটনার উল্লেখ করে জানিয়ে দিলেন এ ধরনের জুলুম অত্যাচার কোন নতুন কিছু নয়, বরং ইব্রাহীম (আঃ) কে এই একই ব্যাপারে কত চরম পরীক্ষার

www.pathagar.com

সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং দৈর্য্যের সঙ্গে সমস্ত প্রকার বিরোধিতার মুকাবিলাও তিনি করেছিলেন। ভবিষ্যতে দ্বীনের কাজে যদি কোন চরম বিরোধিতা আসে তবে তা কিভাবে মুকাবিলা করতে হবে তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হয়েছে।-

ব্যাখ্যা ঃ

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَاتَنْحِتُوْنَ * وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ *

তিনি বললেন, তোমরা কি তার দাসত্ব করবে যা তোমরা নিজ হাতে তৈরী কর। পক্ষান্তরে তিনি তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং যা তোমরা নিজ হাতে বানাও তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন।

এ কাহিনীটা এখানে খুবই সংক্ষেপে বলা হয়েছে। অবশ্য এই একই কাহিনী সূরা আম্বিয়ার মধ্যে বিস্তারিত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তখনকার লোকেরা যখন মন্দিরে গিয়ে দেখল যে, মুর্তিগুলো সব ভাঙ্গা তখন লোকে বলাবলি করতে লাগল যে, ইব্রাহীম নামে এক যুবক মুর্তিপূজার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে, সম্ভবতঃ সেই ছেলেরই কাজ হবে এটা, সমবেত লোকেরা বলল তাকে ধরে আন। তখন একদল লেক গিয়ে তাকে ধরে আনলো। তখন তিনি তাদের কথার জবাবে বললেন, "তোমরা কি তার আনুগত্য করবে যা তোমরা হাতে তৈরী কর (مَاتَنْحِتُوْنَ)। এতে তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ কাজ তিনিই করেছেন।

প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যামানায় লোকেরা চন্দ্র-দেবতা, সূর্য-দেবতা, তারকা-দেবতা ইত্যাদি মানতো এবং এক এক দেবতার এক এক অঞ্চলও তারা মানতো। তারা চন্দ্র-দেবতাকে বলতো "নাম্মার" এবং নাম্মার দেবতার প্রতিনিধিকে বলতো নমরূদ। নমরূদ দাবী করতো যে, আমাকে যা দেবে তা প্রকৃত পক্ষে নাম্মার দেবতাকেই দেয়া হবে। তারা দেবতাদের মুর্তি তৈরী করে রাখতো এবং দেবতাদের নামে জনগণের নিকট থেকে যেমন পূজা আদায় করতো তেমন আনুগত্য এবং ভোগও আদায় করত কিন্তু দেবতারা তার কিছুই পেতো না,

www.pathagar.com

পেতো তাদের প্রতিনিধিরা। আমি এর একটা সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় গাভীর বাছুর বাচ্চা কালে মারা গেলে তার গায়ের চামড়া ছিলে বের করে নেয় এবং কড় কুটো ভরে চামড়া সেলাই করে একটা কৃত্রিম বাছুর তৈরী করে নেয়। অতঃপর গাভী দোহানোর সময় ঐ কৃত্রিম বাছুরকে গাভীর বাটের নিকট ধরে। গাভী মনে করে আমার বাছুরকে দুধ দিচ্ছি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ মরা বাছুর তার এক ফোটা দুধও খায় না, তামাম দুধটুকু খায় ঐ গাভীর মালিক। সে দুধটা আদায় করে বাছুরের নাম নিয়ে, কিন্তু মরা বাছুর তার কিছুই খায় না। ঠিক তদ্রুপ নাম্মার দেবতার নাম করে নমরূদ যা আদায় করতো তার সবটুকুই ভোগ করতো নমরূদ মরা বাছুরের ন্যায় মরা দেবতা কিছুই নিত না। এর দু'টো দিক ছিল। একটা দিক ছিল, মন্দিরে গিয়ে পূজা করা আর কিছু ভোগ দেয়া আর অপর দিক ছিল, দেবতার নামে সমাজকে শাসন করা। এই হিসাবেই নমরূদ ছিল তৎকালীন রাজা। তার দাবী ছিল দু'টি। যথা একঃ তার আইন মেনে চললে দেবতার আইন মেনে জলা হবে। দুইঃ আর দেশের সর্বময় ক্ষমতার মালিক সে নিজে। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নবী হয়ে তা মানতে পারেন না। তিনি তৌহিদের দাওয়াত দিতে থাকলেন এবং পরিষ্কার ভাষায় বললেন যে, তিনি আল্লাহর শাসন ছাড়া আর কারও শাসন মানবেন না। প্রকৃতপক্ষে যারাই নির্ভেজাল তৌহিদে বিশ্বাসী তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের শাসন মানতে পারে না। কাজেই তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী সাব্যস্ত করা হলো এবং সভাসদদের নিয়ে পরামর্শে বসা হলো। পরামর্শের পর সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো যে, যেহেতু সে বলেছে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ্ ছাড়া কারও শাসন মানবে না কাজেই তাকে রাষ্টদ্রোহীদের শাস্তিই দেয়া হবে। এখন যেমন রাজ-দ্রোহীদের ফাঁসি দেয়ার আইন রয়েছে, ঠিক্ তদ্রুপ এর পূর্বে ছিল শুলে চড়ানোর আইন, আর তারও পূর্বে অর্থাৎ নমরূদের আমলে ছিল আগুনে পোড়ানোর আইন। সেই আইন অনুযায়ী তার সভাসদগণ তাকে বলল ঃ

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ *

অর্থাৎ সভাসদরা বলল আগুনের কুণ্ডলী তৈরী করে তার মধ্যে ওকে

www.pathagar.com

নিক্ষেপ করুন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জানতেন যে-

(১) নমরূদের কাছে সারেণ্ডার করলে তাকে আগুনে যেতে হবে না কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি আগুনে পুড়তে প্রস্তুত হলেন কেন?

(২) যখন ফেরেশতাগণ সাহায্য করতে চাইলেন তখনও তিনি তাদের সাহায্য চাননি! কেন সাহায্য চাইলেন না? এবং

(৩) যখন তাকে আগুনে ফেলার সিদ্ধান্ত হলো তখন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে, কাউকে আগুনে ফেলার পর সে আগুন থেকে বেঁচে এসেছিল। ফলে আগুনে ফেলার সময় তার মনের প্রস্তুতি কিরূপ ছিল?

(১) এর স্পষ্ট জবাব হচ্ছে এই যে তিনি তৌহিদের দাওয়াত দিয়েই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি অন্য কোন অপরাধ করে আসামী হননি। ফলে তিনি যদি সারেণ্ডার করতেন তাহলে তাঁকে বলতে হতো যে, আমি অন্যায় করেছি। আমি আমার কথা বা দাবী প্রত্যাখান করছি এবং স্বীকার করছি যে, যে কাজের জন্য আমাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে ঐ অপরাধ আর করবো না। এতে প্রকারান্তরে আল্লাহর অহদানিয়াতের দাবী যা তিনি পেশ করছিলেন সেই দাবীকেই অস্বীকার করা হতো আর স্বীকার করা হতো যে, আল্লাহর অহদানিয়তের দাবী করে আমি অপরাধ করেছি। কাজেই আল্লাহর একজন নবীর পক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে সারেণ্ডার করা কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সারেণ্ডার করতে পারেননি। এরূপ ক্ষেত্রে সারেণ্ডার করার অর্থই হলো ইসলাম থেকে সরে যাওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতকেই অস্বীকার করা। কাজেই একজন নবী কি করে তৌহিদ থেকে সরে পড়বেন? তা কখনই সম্ভব ছিল না।

(২) ফেরেশতাদের নিকট সাহায্য চাইলেও তার অর্থ হতো আল্লাহর উপর আস্থা কম হওয়া। কারণ যেখানে আল্লাহর সঠিক পরিচয় দিয়ে ও তার কাজ করে আগুণে যেতে হচ্ছে, আর তিনি বিশ্বাস করেন যে আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার মালিক, আরও বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ এখানে হাজির রয়েছেন এবং তিনি সবকিছু দেখছেন তখন আল্লাহর উপস্থিতিতে অন্যের

www.pathagar.com

নিকট সাহায্য তিনি কেন চাইবেন? তিনি তো আল্লাহর ক্ষমতাকে কারও চাইতেই কম মনে করতেন না। তাই তিনি কারওই সাহায্য চাননি।

(৩) তিনি জানতেন যে, আগুনে ফেললে কেউ কোন দিনই তার থেকে রেহাই পায় না এবং এটাও বুঝেছিলেন যে সত্যের প্রচারক হয়ে বাতিলের হাত থেকে রেহাই পাওয়ারও কোন পথ ছিল না। কারণ সেই মুহূর্তে একদিকে ছিল একজনই মাত্র ব্যক্তি; আর অপর দিকে ছিল গোটা দেশের সকল প্রকার শক্তি। অর্থাৎ রাজশক্তি, জনবল ও ধনবল ইত্যাদি ধরনের সকল প্রকার শক্তিই ছিল বাতিলের হাতে। তা সবই ব্যবহৃত হয়েছে ইব্রাহীম (আঃ) এর বিরুদ্ধে আর একমাত্র একজনই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন হকের বা সত্যের পক্ষে। কাজেই বাতিলের সমস্ত আঘাত ছিল তার একার উপরে। আর যেহেতু সত্যের দাবীদারকে সত্যের উপর টিকে থাকার অর্থই হলো বাতিলকে অস্বীকার করা। আর যখন গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ছিল বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন সেখানে প্রকাশ্যে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বাতিল বলে প্রচার করার অর্থই হলো গোটা ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। এখানে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে হক কথা বললেই তা হয়ে পড়ে সমাজের গোটা ব্যবস্থাপনার বিপক্ষে আর হক কথা না বললে প্রকারান্তরে বাতিলকেই মেনে নেয়া হয়। ওদিকে বাতিলকে না মানলেই বাতিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়। এর মাঝখানে আর এমন কোন স্থান ছিলনা যেখানে দাঁড়িয়ে বলা যেত যে আমি হকের উপর আছি এবং বাতিলের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই । এরূপ কোন দিন থাকতেও পারে না। ফলে তিনি ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা ভাবনা করে দেখেছিলেন যে, হকের দাবীদার হয়ে হয় বাতিলের চাইতে অধিক শক্তিশালী হয়ে শক্তি প্রয়োগ করে টিকে থাকতে হবে নইলে বাতিলের হাতে শহীদ হতে হবে। এছাড়া তৃতীয় কোন পথ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন পথ কোন যুগেই থাকে না। থাকা সম্ভবও হতে পারে না। আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এমনই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে সত্যের দাবীদার হয়ে নিজ এলাকায় কোন সমর্থক তিনি পাননি একমাত্র তাঁর ভাইপো লুত (আঃ) ছাড়া অন্য কাউকে। আমাদের রাসূল (সঃ) সত্যের প্রচারক হয়ে

www.pathagar.com

কিছু না কিছু সমর্থক অথবা সাহায্যকারী পেয়েছিলেন। যারা অন্ততঃপক্ষে প্রথম সংকটে রাসূলের (সাঃ) হেফাজতে এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্য তা ছিল না। ফলে বাতিলের পাকড়াও থেকে তিনি রেহাই পাননি। অবশ্য আগুনে যাওয়ার পর যদিও তিনি উদ্ধার পেয়েছিলেন কিন্তু উদ্ধার পাবেন এই ভরসা করে তিনি আগুনে যাননি। তিনি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে মরার প্রস্তুতি নিয়েই আগুনে গিয়েছিলেন।

এ আয়াত থেকে শিক্ষা

অতঃপর এখানে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, (১) সত্যের দাবীদার হলে মিথ্যার সঙ্গে টক্কর লাগবেই। (২) আর মিথ্যার সঙ্গে আপোস না করলে মিথ্যা তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে সত্যকে উৎখাত করতে। (৩) আর সত্য যদি সত্য হিসেবে টিকতে চায় তবে মিথ্যা তাকে কোন প্রকারেই বরদাস্ত করবে না। (৪) এতে যদি জীবন যায় তবু তাকে মিথ্যার সঙ্গে আপোস করা যাবে না, তা আগুনে পুড়লেও। এরই নাম হচ্ছে ইসলামের উপর টিকে থাকা। হ্যাঁ, যদি সত্যের অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হয় তবে সংগ্রাম করেও টিকে থাকা যায়। এই সংগ্রামই হলো ইসলামের জিহাদ। এই জন্যেই বলা হয় জিহাদ ছাড়া ইসলাম নেই। তাই অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

وَجَاهِدُوْا حَقَّ جِهَادِهٖ (ওয়াজাহেদু হাক্কা জিহাদিহি) অর্থাৎ জিহাদের হক আদায় করে জিহাদ কর।

فَارَدُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ-

এভাবে তারা চক্রান্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তা নস্যাৎ করে দিলেন। তাদের চক্রান্ত ছিল এই যে–

১। তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- কে আগুনে পুড়িয়ে প্রমাণ করে দেবে যে, তাঁর আল্লাহ নমরূদের শাস্তিকে রুখতে পারেননি।

২। তৌহিদের দাওয়াতকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে।

www.pathagar.com

৩। নমরূদ তার অবস্থানকে মজবুত করে নেবে। ইত্যাদি ধরনের যে সব চক্রান্ত তাদের ছিল, আল্লাহ্ সবগুলোকে নস্যাৎ করে দিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর ব্যাপারে আগুনকে ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক করে দিয়ে।

অতঃপর ঐ জনপদ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর স্ত্রী ও লূত (আঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে। এবং বললেন–

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ *

আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে চললাম তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। কেন তিনি ভিটেমাটি, আপনজন সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন? কারণ তিনি দেখেছিলেন তৌহিদের দাওয়াত যারা গ্রহণ করবে না তাদের মধ্যে অযথা থেকে মূল্যবান সময় ব্যায় করা ঠিক হবে না। যেখানের লোক তৌহিদের দাওয়াত গ্রহণ করবে সেখানেই তিনি চলে যাবেন, এই নিয়তেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। এ থেকে তিনি প্রমাণ করলেন যে, মুসলমানদের নিকট ঘরবাড়ী, জায়গা-জমি, আত্মীয়-স্বজন এসব কিছুর চাইতে দ্বীনের দাওয়াত বা আল্লাহর দিকে আহবান করার কাজই অধিক দামী। এই কথাই আল-কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন-

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *

এবং কথায় কে তার চাইতে ভাল যে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং ভাল কাজ করে, আর বলে যে- আমি একজন মুসলমান।

অর্থাৎ মুসলমান হিসাবে আল্লাহর দিকে আহবান করার কাজই যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ তা জেনে এবং মেনে নিয়েই সব কিছু ত্যাগ করে দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। যখন বেরিয়ে পড়েন তখন সঙ্গে ভাইপো লূত (আঃ) ও স্ত্রী হাজেরা বিবি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখনও তাঁর কোন সন্তান জন্মেনি। পরে তিনি আল্লাহর নিকট সন্তান চেয়েছেন। আল্লাহ তাকে সন্তান দিয়েছেন। তাঁর প্রথম ছেলে ইসমাঈলের

www.pathagar.com

যখন জন্ম হয় তখন ইব্রাহীম (আঃ) এর বয়স ছিল ৮৬ বছর, পরে দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক (আঃ) এর যখন জন্ম হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ১০০ বছর। তিনি দ্বীনের দাওয়াত দিতে দিতে যখন প্রৌঢ় অবস্থায় পৌছলেন এবং চিন্তা করলেন আমার পরে কে করবে এ কাজ। এই সব চিন্তা করে তিনি আল্লাহর নিকট সন্তান চাইলেন, তাঁর দলীল মিলবে নিম্নের আয়াত থেকে তিনি বললেন-

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ * فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ *

হে আমার রব! আমাকে সলেহ্ সন্তাহ্ দান কর ! অতঃপর (আল্লাহ বললেন) আমি তাকে একটা অতীব ধৈর্যশীল সন্তানের সংবাদ দিলাম।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তিনি আল্লাহর কাছে ছেলে চাইলেন।

(১) আল্লাহরই কাজের জন্য; নিজের জন্য নয়।

(২) চাইলেন সলেহ্ সন্তান অর্থাৎ যে সন্তান অন্যায়কে উৎখাত করে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করবে তাকেই বলে সলেহ্ সন্তান। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা মুতাবিক এক সলেহ্ (নেক) সন্তান দিলেন। সেই সন্তানই হযরত ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ্ বলেন-

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ *

অতঃপর ঐ সন্তান যখন তাঁর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ানোর বয়সে পৌছলেন তখন একদিন তিনি বললেন, " হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখো কি করা যায়। তিনি বললেন, " হে পিতা, আল্লাহ আপনাকে যা করতে হুকুম করেছেন আপনি তাই করুন। তাহলে আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হিসাবে দেখতে পাবেন।

www.pathagar.com

এখানে প্রশ্ন, আল্লাহ যখন ছেলেকে জবেহ করার হুকুম করলেন তখন ইব্রাহীম (আঃ) এই হুকুমকে রদ করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে করতে পারতেন। তিনি বলতে পারতেন–

(১) হে আল্লাহ তোমার জন্য আগুনে গিয়েছি, দেশ ছেড়েছি, ঘরবাড়ী ধনসম্পদ আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়েছি। এসব কিছুর বিনিময়ে আমার ছেলেটাকে কুরবানী করা থেকে রেহাই দাও, আল্লাহ এই হুকুমটাকে তুমি ফেরত নাও কিন্তু তা তিনি বলেননি।

(২) তিনি একথাও বলতে পারতেন যে আল্লাহ তোমার দ্বীন প্রচারের জন্যই ছেলে চেয়েছিলাম, আল্লাহ একে দ্বীনের কাজের জন্যেই বেঁচে থাকতে দাও। অথবা

(৩) তিনি বলতে পারতেন আল্লাহ তুমি এ কেমন নিষ্ঠুর হুকুম দিলে। এমনকি মনে মনেও চিন্তা করতে পারতেন যে, আল্লাহর এ হুকুমটা কেমন কড়া হুকুম হয়ে গেল। তাও তিনি মনে করেননি।

এধরনের কিছুই তিনি বলেননি এবং মনে মনেও এধরনের কোন চিন্তা তিনি করেননি। কারণ তিনি জানতেন যে,

(১) আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যেই করেন। তা প্রকাশ্যে অন্য কোন রূপ দেখা গেলেও।

(২) আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত কোন ইচ্ছা করা বা কিছু বলার কোন অধিকার নেই। কারণ তিনি আল্লাহর অনুগত দাস।

(৩) আল্লাহর ইচ্ছা 'ভাল না' 'মন্দ' এ ধরনের চিন্তা করাও কুফরী। কাজেই তিনি কুফরী চিন্তা করবেন কেন?

৪। আল্লাহর চাইতে বেশী বুঝার চিন্তা করা বা দাবি করাও কুফরী। এ সবই তিনি বুঝতেন এবং এ কথাও বুঝতেন আল্লাহর হুকুম পালনের মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক সফলতা। কাজেই তিনি আল্লাহর হুকুমই পালন করতে উদ্যত হলেন। তিনি যখন চোখ বেধে

www.pathagar.com

জবেহ করেছিলেন তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি কি কাটতেছি এবং যখন চোখ খুলতেছিলেন তখনও এই নিয়তেই চোখ খুলতেছিলেন যে চোখ খুলেই দেখবো ছেলে আমার গলাকাটা অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু তা দেখলেন না। দেখলেন ছেলে ঠিকই বেঁচে আছে। আল্লাহ্ বললেন এটা একটা স্পষ্ট বড় ধরনের পরীক্ষা। প্রশ্ন, তিনি কি পূর্বে জানতেন যে, ছেলে এভাবে বেঁচে যাবে? না তা জানতেন না, যেমন জানতেন না আগুনে যাওয়ার পূর্বে যে সেখান থেকে না পুড়ে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসা যাবে। তিনি তো ছেলেকে তাঁর নিয়ত মুতাবিক কুরবাণী করেই দিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন আল্লাহর হুকুম না মানলে এমন কি আপরাধ হতো? অপরাধ হতো এতটুকু যে তাঁকে যখন আল্লাহ্ বলেছিলেন " আস্‌লিম্" " তুমি মুসলাম হও" অর্থাৎ তুমি আল্লাহর পুরা অনুগত হও তখন তিনি বলেছিলেন" আসলামতু লিরাব্বিল আ'লামীন।"

আমি রাব্বুল আ'লামীনের পুরা অনুগত হয়ে গেলাম। একথা বলার পর আল্লাহ্র যে কোন হুকুম পালন না করার অর্থ হলো আল্লাহ্র অনুগত না থাকা বা আল্লাহ্র আনুগত্য না করা। আর অনুগত না থাকার অর্থই মুসলমান থাকতে রাজী না থাকা। এসব তিনি বুঝতেন বলেই আল্লাহ্র যে কোন হুকুম তিনি মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, মুখে মুখে মুসলামান দাবী করা আর কাজে অন্য কিছু করার নাম মুসলমানী নয়।

শিক্ষা

এ ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় এই যে,

১। মুসলমান হতে হলে আল্লাহর হুকুম যেমনই হোক না কেন তা মানতে হবে বিনা বাক্য ব্যয়ে এবং কি ও কেন প্রশ্ন ছাড়াই। আর তা মানলে তার ফলাফল ভালো হবে কি মন্দ হবে সে চিন্তাও করা যাবে না। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আর আল্লাহর হুকুম মানলে তার ফল কোন দিনও খারাপ হয় না।

www.pathagar.com

২। আল্লাহর হুকুম কোনটা সহজ ও কোনটা কঠিন তা দেখা চলবে না। হুকুম সহজই হোক আর কঠিনই হোক তা মেনে চলার ব্যাপারে মনের ঝোক একই প্রকার থাকতে হবে। কারণ মানব জীবনের চরম লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর যাবতীয় হুকুম আহকাম মেনে চলে সর্বদাই আল্লাহকে রাজী রাখা। কাজেই মুসলামানদের মনের বুঝ সর্বদাই এমন থাকতে হবে যে, আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে বাঁচলে জীবন সফল মরলেও জীবন সার্থক।

৩। আল্লাহর হুকুম মানার ব্যাপারে দুনিয়ার কোন লাভ লোকসান, কোন মায়া মহাব্বত, কামনা-বাসনা বা কোন কিছুর প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারবে না। এইটাই মুসলমানী অতঃপর লক্ষ্যণীয় যে এর পর আল্লাহ বলেছেন–

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ *

অতঃপর যখন তারা দুইজনই ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন ছেলেকে মাথা মাটিতে রেকে জবেহর উদ্দেশ্যে শুইয়ে দিলেন।

প্রশ্ন ঃ এখানে কেন আসলামা' শব্দ ব্যবহার করা হলো। এখানে দ্বিবচনে 'আসলামা' বলে কি বুঝান হলো? অর্থাৎ তাঁরা বাপ– বেটা দুইজনই 'আসলামা" বা মুসলমান হলেন। কেন? এর পূর্বেও তো তাঁরা মুসলমান ছিলেন। শুধু তাই নয়, ইব্রাহীম (আঃ) নবীও ছিলেন। এর পরও আবার নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করা লাগে কোন কারণে। তাহলে মুসলমান হওয়ার অর্থ কি দাঁড়াবে? প্রকৃতপক্ষে মুসলামনের অর্থই হলো আল্লাহর অনুগত হওয়া। এখানেও আস্‌লামার অর্থ হলো তাঁরা দুইজনই আল্লাহর হুকুম মানতে রাজী হলেন। পিতা রাজী হলেন জবেহ করতে আর ছেলে রাজী হলেন জবেহ হতে। এখান থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা গেল যে মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো আল্লাহর হুকুম কাঁটায় কাঁটায় মানতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকা, তা জীবন দিয়ে হলেও।

এবার আসুন চিন্তা করি আমরা কোন পর্যায়ের মুসলমান। আমরা বেশ পোশাক–পরিচ্ছদে অনেকেই পাক্কা মুসলমান, কিন্তু যুক্তির কষ্টিপাথরে

www.pathagar.com

যাচাই করলে আমরা টিকবো কি পাকা মুসলমান হিসাবে? আমরা তো দেখি যেখানেই আল্লাহর হুকুম কঠিন বা দুনিয়াবী কোন লোকসানের অথবা যে- কোন দিক থেকে স্বার্থহানির ভয় আছে সেখানেই আমরা নেই।

আমরা কি সব ব্যাপারেই আল্লাহর আনুগত্য করি? যদি উত্তর 'না' হয় তবে প্রশ্ন কেন তা করি না। এর একটাই মাত্র কারণ আর তা হচ্ছে এই যে দুনিয়াবী কোন স্বার্থের ব্যাপারে কিছু না কিছু ঘাটতি বুঝলেই আমরা সেখানে নেই। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে। আমরা যখন জাতে মুসলমান অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত একটা দল, তখন-

(১) আমাদের সমাজে মদপান করলে ইসলামী বিধান মুতাবিক শাস্তি নেই কেন?

(২) চুরি করলে হাত কাটা আইন- যা আল্লাহর হুকুম সেটাকে-আমরা কি মনে করি? মুসলমান থাকার জন্য যেখানে সন্তানের গলাকাটতে কোন আপত্তি উত্থাপন হলো না সেখানে চোরের হাত কাটতে আপত্তি কেন?

(৩) যেনার শাস্তি দোররা মারা যা আল্লাহর হুকুম তা আমরা কোন নজরে দেখি?

(৪) আল্লাহর যে কোন আইন তা ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত হোক বা ব্যক্তিগত হোক কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হোক অথবা লেখাপড়া বা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চা ব্যাপারে হোক কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ–সন্ধি চুক্তির ব্যাপারে হোক, প্রত্যোকটি ব্যাপারে আল্লাহর বিধান এ সমাজে নেই কেন? এটাই কি আমাদের পাকা মুসলমানী লক্ষণ? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর ছেলে কুরবানীর ঘটনা আল্লাহ্ অহী আকারে নাযিল করলেন, তা কেন নাযিল করলেন? এর একমাত্র কারণ হলো এই যে, আমরা যেন এই ঘটনা থেকে সত্যিাকারের মুসলমানী কি তা বুঝতে পারি এবং যেন সেই মুতাবিক চলতে পারি, সে জন্যেই আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ)- এর এ ঘটনা আমাদের শুনালেন।

www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) কে ডেকে বললেন-

وَنَادَيْنَهُ اَنْ يَّاِبْرٰهِيْمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ *

হে ইব্রাহীম! তুমি অবশ্যই তোমার স্বপ্নে পাওয়া আদেশ সত্যে পরিণত করেছ। প্রশ্ন ঃ কেন তা ডেকে বলা হলো? বলা হলো এই জন্য যে, তিনি যেন বুঝতে পরেন।

(১) ছেলেকে সরিয়ে নেয়া এবং তার পরিবর্তে দুম্বা কুরবানী হওয়া আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবিকই হয়েছে। এবং

(২) এটাও জানিয়ে দেয়া হলো যে, ইব্রাহমি (আঃ)-এর মনটা যে সত্য সত্যই আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল আল্লাহ তার স্বীকৃতি দিলেন।

(৩) আর জানিয়ে দেয়া হলো ইব্রাহীম (আঃ)- এর ন্যায় যারাই মুহসীন হতে পারবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আল্লাহর আচরণ এই রূপই হবে। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককেই এভাবে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। অতঃপর আল্লাহ বললেন-

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ *

এটা অবশ্যই একটা বড় রকমের পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষায় পাস করার কারণেই আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন–

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا *

আমি তোমাকে গোটা মানব জাতির ইমাম বানালাম।

নেতৃত্বের যোগ্যতা

বড় ধরনের কয়েকটি পরীক্ষার পরই আল্লাহ বললেন-

এখন আমি তোমাকে গোটা দুনিয়ার মানুষের নেতা করে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে এধরনের বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া কাউকে নেতৃত্ব দিলে তার দ্বারা ক্ষতি ছাড়া কোন দিক থেকেই লাভ হতে পারে না। আর এ

www.pathagar.com

ধরনের পরীক্ষায় পাস করার অর্থই হলো সত্যিকার অর্থে মুসলমান হওয়া। তাহলে এর থেকে শিক্ষা হচ্ছে এই যে, গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব পরীক্ষিত মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব। আমরা বাস্তবেও দেখি পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই যে, অমুক নেতা অমুসলমান ছিলেন আর তার রাজত্বে মানুষ সবদিক থেকেই সুখী ছিল।

কিন্তু এমন নজীর ভুরি ভুরি রয়েছে যে যারাই ছিলেন পরীক্ষিত খাঁটি মুসলমান তাদের শাসন আমলে মানুষ কতইনা সুখের জীবন যাপন করেছে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বললেন-

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ *

এবং আমি তাকে একটা বড় ধরনের জবেহ দ্বারা বিনিময় করে নিলাম।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে ঐ ছেলেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তো কুরবানী করেই দিয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ তার [ইসমাঈল (আঃ) এর] খালাস করে নিলেন। তাহলে এখন ছেলেটির মালিকানা হলো কার? এখন কিন্তু ঐ ছেলের পুরা মলিকানা আল্লাহর। আর এর মালিকানা পুরাপুরি আল্লাহর হওয়ার অর্থ হলো এ ছেলের গোটা জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপই হবে আনসারুল্লাহর কাজ। অর্থাৎ আল্লাহর কাজ হিসেবে যেটাই পরিগণিত হবে এটাই হবে ঐ খালাস করে নেয়া ছেলের কাজ। তাহলে মুল অবস্থাটা দাঁড়াল কি? অবস্থা দাঁড়াল এই যে, কাজের জন্য হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ছেলে চেয়েছিলেন সেই কাজের জন্যেই আল্লাহ ছেলেটাকে খাস করে নিলেন।

এখানে আরো লক্ষ্যণীয় এই যে, তিনি চেয়েছিলেন নির্জনে ছেলে কুরবানী করবেন যেন দুনিয়ার কেউ না দেখে। দেখলে দু'টো- ব্যাপার ঘটার আশংকা ছিল (১) লোকে বাধা দিত (২) রিয়ার অপবাদ দেয়ার ভয় ছিল। কাজেই তিনি চাননি যে কেউ তার কুরবানী দেখুক, কিন্তু আল্লাহ চাইলেন যে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত লোকদের তিনি তা দেখাবেন। তাই বললেন।

www.pathagar.com

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ *

পরবর্তীকালের লোকদের জন্য এটাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্থাপন করলাম। তিনি [হযরত ইব্রাহীম (আঃ)] এই যে সন্তান দান করে একটা কাজ করলেন, যা হবে কিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তী কালের লোকদের মুসলমানী আমল আখলাক শিক্ষা দেয়ার জন্য একটা নজীর বিহীন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ কারণেই আল্লাহ স্বয়ং তার প্রশংসা করলেন, বললেন–

سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ *

" শান্তি হোক ইব্রাহীমের প্রতি। " এর মধ্যেও একটা উজ্জ্বল শিক্ষা রয়েছে আমাদের জন্যে। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি পাওয়ার হকদার আমরা তখনই হতে পারব যখন প্রমাণ করতে পারব যে আল্লাহর হুকুমের চাইতে আমরা জান মাল সন্তান- সন্ততি এর কোনটারই মূল্য বেশী মনে করি না এবং প্রমাণ করতে পারব যে, আমার জীবনকে আল্লাহ যে কাজে ব্যাবহার করতে চান আমার জীবনকে আমি সেই কাজেই ব্যবহার করতে সদাই প্রস্তুত আছি। তা আগুনে পুড়েই হোক বা ঘর বাড়ী ধন-সম্পদ ত্যাগ করেই হোক কিংবা সন্তান কুরবানী করেই হোক বা অন্য কিছুই করে হোক না কেন।

এর পর আল্লাহ জোর দিয়ে বুঝানোর জন্যে পুনরায় বললেন যে,

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ *

এভাবেই আমি মুহসিন ব্যাক্তিদেরকে পুরষ্কৃত করে থাকি। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- এর একার ব্যাপারেই শান্তির ঘোষণা নয়, যারাই তাঁর মুসলসানীর ন্যায় মুসলমানীর প্রমাণ করতে পারবে তাদের প্রত্যেকের জন্যই এই একই জাযা বা পুরস্কার এবং একই সালাম বা শান্তি । যেমন ছিল এ যুগে মরহুম মওঃ মওদূদীর ফাঁসীর হুকুম হলে তার হাত থেকে উদ্ধার করে দেয়ার ব্যাপারে। তেমনই থাকবে আর যে কোন মুহসিনের

www.pathagar.com

বেলায়ও। এ ব্যাপারে আল্লাহর কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে যারাই এহ্সানের নীতি অবলম্বন করে তাদেরকেই আল্লাহ এমনভাবে পরীক্ষা করেন যে, পরীক্ষা চলাকালে মনে হয় চরম বিপর্যয় হলো বুঝি কিন্তু অবিচল ঈমানে টিকে থাকলে পরে দেখা যায় সবই ঠিকঠাক রয়েছে। কোনটারই কোন ক্ষতি হয় নাই বরং লাভ হয়েছে পরম সন্মান। ইহ্কালেও এবং পরকালেও। এর পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মুসলমানী কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর আল্লাহ বললেন–

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ *

" অবশ্যই তিনি মু'মিন বান্দারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।" হযরত নূহ (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনার পর ঐ একই কথা বলা হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুখে মুখে দাবী করলেই কেউ মু'মিন হতে পারে না, তাকে কাজ দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে , তার দ্বারা ঈমানের দাবী পুরণ হয়। যেমন পুরণ হলো ঐ সব নবীগণের দ্বারা। অর্থাৎ ঈমানের কতকগুলো আবশ্যিক শর্ত আছে। সে শর্তগুলো পুরণ করতে পারলেই তাকে মু'মিন বলে আল্লাহ স্বীকার করেন। আর যারা ঈমানের শর্তগুলো পুরণ করতে পারে না, তাদেরকে আল্লাহ্ ঈমানদার বলে স্বীকার করেন না। হ্যাঁ, তবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন- তারা ধারণা করে যে, তারা ঈমানদার।

উপসংহার

কুরবানীর শিক্ষার এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে সত্যিকার মুসলমানী হ্চ্ছে ' কি' ও 'কেন' প্রশ্ন ছাড়াই আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়া এবং আল্লাহ যখনই যাকে যে হুকুম করবেন তখনই তাকে সেই হুকুম মুতাবিক কাজ করা। যেমন করছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) । তিনি মুসলমানীর উপর টিকে থাকার বিনিময় কঠিন বিপদকে বরণ করে নিয়েছেন। তিনি রাজী হয়েছেন–

www.pathagar.com

(১) আগুনের কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হতে,

(২) সদ্যজাত শিশু সন্তানকে তার মা সহ মরুভূমির মধ্যে রেখে আসতে। এবং

(৩) নিজ হাতে নিজের সন্তানকে কুরবানী করতে।

এর কোনটাতেই তার কোন দ্বিধা ছিলনা এবং ছিলনা কোন আপত্তি। আর আমরা যদি সত্যই চাই যে এ সব নবীগণ যে বেহেশতে যাবেন আমরাও সেই বেহেশতে যাব, তাহলে আমাদেরকেও আমাদের যাবতীয় বাস্তব কার্য-কলাপ দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে হবে যে আমরাও তাঁদের ন্যায় ইসরামের উদ্দেশ্যে জান মাল কুরবানী করার মত মনের অধিকারী।

বলাবাহুল্য, এই ধরনের মন যে ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজন তা বুঝানোর জন্যে এবং যেন আমাদের মনের প্রস্তুতি এভাবে মরণ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখতে পারি সে জন্যে প্রতি বছরই কোন পশু কুরবানীর মধ্যেমে আল্লাহ আমাদের মন ও জ্ঞানের সামনে ইব্রাহীম (আঃ) এর সন্তান কুরবানীর কথাটাকে তুলে ধরেন।

কাজেই আমাদের মনকে এমনভাবে প্রস্তুত রাখা উচিৎ যেন আমাদের দ্বারা আল্লাহরই উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫